Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
UGC Enlisted Serial No. 48666
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 106-116
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রাবন্ধিক দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতীয় নাট্যচিন্তা

সুরজিৎ মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা, বিহার

Abstract

Digindrachandra Bandopadhyay was a famous dramatist in the 20th Century. He wrote a number of essays on drama. His essays were published in various magazines. His essays are compiled mainly in two books. They are 'Natyochinta: Silpojiggasa' (1978) and 'Sreshtho Natyoprobondho' (1986). In the first book he discusses about domestic and foreign theaters in about twelve chapters. The second book has 15 essays. The idea of Indian theatrical thoughts is discussed in these essays mainly. He was a journalist also so in his essays the identity of neutral views is found. In terms of speech, we can divide his essays into two categories. Namely, Essay on drama and dramatics, Essay on the nature of Gananatya and Navanatya movement. The environment and situation of Indian drama in the late half of the 20th century is the main highlight of his essays. He believed every artist was responsible for the society. So the effort will be made to create a healthy society for the next generation. This social responsibility is the main tune of all his essays.

Keywords: Digindrachandra Bandopadhyay, Gananatya, movement, Navanatya, dramatics, Essay.

গ্রীক্ দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন সাহিত্যিকের কাজ হল অনুকরণের অনুকরণ করা। এই অনুকরণ আবার নানারকমভাবে হতে পারে। যেমন সাংবাদিকের কাজ হল হুবহু অনুকরণ করা। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ছিলেন একই সঙ্গে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। সাহিত্যিকের প্রতিভা আর সাংবাদিকের নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির চরম উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় তাঁর নাট্যসাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতে।

তিনি স্বভাবজাত অনুরাগে শিল্প-সাহিত্য চর্চা করেছিলেন। অভিনেতা, নাট্যকর্মী ও নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্রের জীবনের অনেকখানি সময় অতিবাহিত হয়েছিলো গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে। সারা জীবনে তিনি গণনাট্য সংঘ ছাড়াও একাধিক নাট্যসংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে নিজেই একাধিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি যেসব নাট্য সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেগুলি হল,- **প্রগতি শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, মঞ্চালোক নাটমহল, গণসংস্কৃতি সংঘ, অশনি চক্র, নাট্যকার সংঘ** ইত্যাদি। মার্ক্সীয় দর্শন তাঁকে দিয়েছিল সাম্যবাদে দীক্ষা আর সাংবাদিক জীবন তাঁকে দিয়েছিল বিশ্বের রাজনৈতিক পালাবদলের খবরাখবর। মার্ক্সীয় সাম্যবাদের আলোকে মানব সভ্যতার কল্যানকামী ঐতিহ্যকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধগুলিতে 'পরিবর্তনশীল বিশ্বে স্বদেশচিন্তার সঙ্গে বিশ্ব-বোধের অন্বয়প্রয়াস'

লক্ষ্য করা যায়। তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ও বাস্তব অনুভবের ফসল এই প্রবন্ধগুলিতে নান্দনিক অনুভূতির স্বাদ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর নাট্যসাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবেশিকা ও উপসংহার সহ বারোটি অধ্যায়ে সম্বলিত তাঁর প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'নাট্যচিন্তাঃ শিল্পজিজ্ঞাসা'(১৯৭৮) ইম্প্রেসন সিন্ডিকেট থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন নির্মল চন্দ্র শীল। এই গ্রন্থের কয়েকটি মাত্র অধ্যায়ে ভারতীয় নাট্যচিন্তা বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। বাকি অধ্যায়গুলিতে আছে পাশ্চাত্য নাট্যচিন্তার সম্পর্কিত আলোচনা। আমাদের আলচনায় কেবলমাত্র ভারতীয় নাট্যচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি রাখা হয়েছে। দিগিন্দ্রচন্দ্রের ভারতীয় নাট্যচিন্তা বিষয়ক অন্য গ্রন্থটি হলো 'দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রবন্ধ'। কবি বিরাম মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সুনির্বাচিত ১৫টি প্রবন্ধ 'দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রবন্ধ' নামে প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৮৬ খ্রিঃ।

বক্তব্য বিষয়ের নিরিখে তাঁর প্রবন্ধগুলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি। যথা-

[এক] নাট্যসাহিত্য ও নাট্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ:

সমালোচনার মানদণ্ড, রবীন্দ্র-নাট্যের রবীন্দ্র-ভাষ্য, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য কি গ্রিক্ নাটকের ছায়া, নাটক সৃষ্টির উৎস, নাটকের সাহিত্যমূল্য, পরিবর্তনশীল বিশ্বে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, নাটকের পাঠচক্র, ইতিহাসের বিচারে বাংলা নাটক, নাটকে হিন্দু মুসলিম চরিত্র, তিন দশকের নাট্যসমীক্ষা, . নাটকের জাত বিচার শ্রমের নান্দনিকতা, শিল্পকর্মে দ্বান্দ্বিকতা, সর্বহারার মানবতা প্রভৃতি।

[দুই] গণনাট্য ও নবনাট্য আন্দোলনের গতি প্রকৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ:

গড্ডালিকার সংস্কৃতি, কৃত্তিম উত্তেজনা, পরস্পর বিরোধী দুই শিল্পচিন্তা, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটক এর গতি-প্রকৃতি, গণনাট্য আন্দোলনের বিকৃত ব্যাখ্যা, গণনাট্য আন্দোলনের উত্তরাধিকার, সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে মতাদর্শের দ্বন্দ্ব, বর্তমান বাংলা থিয়েটারে প্রগতির বিচার প্রভৃতি।

নাট্যসাহিত্য ও নাট্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ: দিগিন্দ্রচন্দ্রের নাট্যসাহিত্য ও নাট্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে বলা যেতে পারে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলিতে তাঁর বৈচিত্র্যময় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলির চিরকালীন আবেদন রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ গবেষকের মতো তিনি বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

'নাট্যচিন্তাঃ শিল্পজিজ্ঞাসা'(১৯৭৮) প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রবেশিকা অংশে 'সমালোচনার মানদণ্ড' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন শিল্প ও সাহিত্য সমালচনার মানদণ্ড কি হওয়া উচিৎ। একজন সৎ সমালচকের কি কি গুণাবলী থাকা দরকার তাও ঐ আলোচনায় তুলে ধরেছেন। প্রাবন্ধিক মনে করেন সমালোচককে হতে হবে শিক্ষকের মতো। তিনি শিল্পী বা লেখকের ভুলত্রুটিগুলো দেখিয়ে দেবেন আবার দর্শক বা পাঠকের দৃষ্টি খুলে দেবেন। সমালোচক এর প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। এই জ্ঞানের দ্বারা সমাজবিজ্ঞানের মানদণ্ডে শিল্প-সাহিত্যকে বিচার করতে হবে। প্রথমে শিল্প বা সাহিত্যের রচনাশৈলী তারপরে তার বিষয় এবং শেষে তার ভাবসম্পদ নিয়ে আলোচনা করতে হবে। "অতএব একজন সমালোচককে হতে হবে একাধারে গবেষক ও ব্যাখ্যাকার অর্থাৎ সমালোচককে ঐতিহাসিক দায়িত্বও পালন করতে হবে।"[১] তাৎক্ষণিকভাবে গুনাগুন বিশ্লেষণ করতে গেলে ভুল হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় সাহিত্যের আপাত দুর্বোধ্যতার অন্তরালে কোন তত্ত্ব বা অন্তর্নিহিত রস লুকিয়ে থাকে। সমালোচকের কাজ সেই অন্তর্হিত রসকে তুলে ধরা। শিল্পীর মতো সমালোচকেরও থাকতে হবে অনুধাবনযোগ্য কল্পনাশক্তি। তা না হলে তিনি শিল্পীর মনস্তত্ত্ব ঠিকঠাক বুঝতে পারবেন না। কোন বাঁধাধরা সংজ্ঞায় ফেলে শিল্প-সাহিত্যের বিচার করা সম্ভব নয় তাই সমালোচককে ব্যক্তিগত মতাদর্শ অতিক্রম করে নিরপেক্ষভাবে শিল্প-সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে হবে।

'নাটক সৃষ্টির উৎস' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক একটি মৌলিক জিজ্ঞাসার বিশ্লেষণ করেছেন। নাট্যকারের নাটক সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি আর দর্শকরা কেন নাটক দেখতে ছুটে যান। যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে প্রাবন্ধিক নাটক সৃষ্টির উৎস সন্ধান করেছেন এই প্রবন্ধে। সব ভালো নাটকের একটা সম্মোহনী শক্তি থাকে। দর্শক সেই সম্মোহনী শক্তিতে কিছুক্ষণের জন্য স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যায়। এমনকি নাটক দেখে উত্তেজিত দর্শক কখনো কখনো তীব্র প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করে ফেলেন। সেই ধরনের নাটকই ভালো নাটক যা মানুষের মনকে পরিতৃপ্ত ও তার কল্পনা শক্তিকে প্রসারিত করে। ভালো নাটক অর্থ বা যশ লাভের জন্য লেখা হয়না। কবি, শিল্পী, নাট্যকার, সাহিত্যিক সকলের শিল্প সৃষ্টির মূলে থাকে সৃষ্টির তাগিদ। "সৃষ্টির তাগিদই নাট্য রচনার মূল প্রেরণা । নাট্যকার তাঁর অন্তরের উপলব্ধিকে নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে আনন্দ পান বলেই তিনি নাটক রচনা করেন।"[২] নাট্যকার সাধারন জীবন থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেন এবং আপন অনুভূতির রং মিশিয়ে অসাধারণ ভাবে তাকে উপস্থাপন করেন। মহৎ নাট্যকার দৃষ্ট জগৎ ও জীবনকে উন্নত থেকে উন্নততর রূপে প্রকাশ করেন। সত্য প্রচারের আন্তরিক প্রেরণা নাট্যসৃষ্টির মূল উৎস বলে মনে করেন প্রাবন্ধিক। নাট্য সৃষ্টির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বার্নার্ড শ, রবীন্দ্রনাথ, আইরিশ নাট্যকার জে. এম. সিঞ্জ প্রমুখের মতামত তুলে ধরেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের এবং নিজের লেখা 'মশাল' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গের উদাহরণ দিয়ে প্রাবন্ধিক দিগিন্দ্রচন্দ্র বক্তব্যকে অত্যন্ত প্রাঞ্জল করে তুলেছেন।

'নাটকের সাহিত্য মূল্য' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন অন্যান্য সৃজন সাহিত্যের মত নাট্যসাহিত্যেরও একটি সাহিত্য মূল্য আছে। অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে নাট্যসাহিত্যের প্রধান তফাৎ হলো এটি দৃশ্যকাব্য। তাই নাটকের সাহিত্যমূল্য দর্শক-শ্রোতা এবং পাঠক উভয়ের উপর নির্ভর করে। এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের সাহিত্যমূল্য নিরুপনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সাহিত্যের মূল্য নির্ধারিত হয় রসজ্ঞ পাঠক ও শ্রোতাদের দ্বারা কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে দর্শকের একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে প্রাবন্ধিক মনে করেন রঙ্গমঞ্চে যে নাটক যত জনপ্রিয়ই হোক না কেন, একদিন না একদিন তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবেই। নাটকটি তখন চলে যাবে পর্দার আড়ালে। তাই নাটকের সাহিত্যমূল্য বিচারের জন্য হাজির হতে হয় পাঠকের দরবারে। পাঠকের কাছে নাটকটি কতখানি জনপ্রিয় তার নিরিখেই নাটকের সাহিত্য মূল্য যাচাই করা হয়ে থাকে। আমরা কালিদাসের 'শকুন্তলা', গ্যায়টের 'ফাউস্ট', শেক্সপিয়ারের নাটক, রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' এর নাট্যাভিনয় হয়তো দেখিনি কিন্তু তার সাহিত্যরূপ পড়েছি। অগণিত সাহিত্য রসপিপাসু পাঠক নাটক পড়েই তৃপ্তি লাভ করেন। প্রাবন্ধিক তাই মনে করেন নাটকের পাঠ্যরূপের উপরে নির্ভর করে নাটকের প্রকৃত সাহিত্যমূল্য। নাটকের সাহিত্য মূল্য হ্রাস পাবার একটি কারণ বর্তমান নাট্যকাররা নাটক পড়েন না, মঞ্চাভিনয়ের কলাকুশলতা সম্পর্কেও তাঁদের অভিজ্ঞতা যৎসামান্য। নাট্যাভিনেতারাও নাটক পড়েন না। এছাড়াও মাতৃভাষায় রচিত নাটক সম্পর্কে তাঁদের মনে তাচ্ছিল্য ভাব বাংলা নাটকের সাহিত্যগুণ হ্রাসের অন্যতম কারণ। বাংলা নাটকের সাহিত্য মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম উপায় নাটকের পাঠকগোষ্ঠী ও পাঠচক্র গড়ে তোলা। প্রাবন্ধিক তাই স্থূলরসের প্রভাব থেকে বর্তমান নাটককে মুক্ত করার জন্য পাঠকগোষ্ঠী ও পাঠচক্র তৈরীর মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।

'শ্রমের নান্দনিকতা' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে শ্রমের নান্দনিক দিক নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রমিকের শ্রমের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে সমাজ ও সভ্যতা। শ্রম কায়িক ও বৌদ্ধিক এই দুই ধরনের হতে পারে। শ্রম সাধারাণত কষ্টদায়ক হলেও, এর মধ্যেই কখনো কখনো আনন্দ লুকিয়ে থাকে। শিল্প-সাহিত্যে আনন্দের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তিনি নান্দনিক সত্যের গোড়ার কথা খুঁজে বের করেছেন।

সাধারণভাবে বলা যায় যেকোনো নির্মাণকার্যের পিছনে প্রচুর শ্রম লুকিয়ে থাকে। আর শ্রম সাধারণ অর্থে শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দেয়। কিন্তু কখনো কখনো শারীরিক শ্রম স্রষ্টাকে কষ্টের বদলে আনন্দ দেয়। একেই বলে শ্রমের নান্দনিকতা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় তাজমহলের প্রতিটি মর্মর প্রস্তর স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই স্রষ্টার মনে

কাজ করেছিল সৃষ্টির আনন্দ ও সৌন্দর্যবোধ। প্রয়োজনীয় শ্রমের পেছনে কাজ করে অর্থ লাভের আনন্দ। আর অপ্রয়োজনীয় শ্রমের পেছনে কখনো কখনো থাকে নির্মল আনন্দবোধ। যেমন ফুটবল, তাস খেলা, দাবা খেলা ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় শ্রমের জগতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিয়ে জয় ছিনিয়ে নেয়ার মধ্যেই কাজ করে আনন্দবোধ। পরিস্থিতির তীব্র প্রতিকূলে গিয়েও মানুষ কখনো কখনো শ্রমদান করে আনন্দ পায়। যেমন ঝড়ের বিরুদ্ধে নৌকা চালানো, দেশের জন্য যুদ্ধ করা ইত্যাদি। পরশ্রমজীবীরা বসে বসে আনন্দ ভোগ করে কিন্তু সৃষ্টির আনন্দ তারা পায় না। ব্যবসায়িক বুদ্ধি নিয়ে শ্রমদান করে আনন্দ পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানী প্যাভলভ বলেছেন শুধু নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির থাকলে হবেনা, লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আবেগ ও কর্ম সক্রিয়তা থাকা চাই। শ্রম থেকে আনন্দ লাভ করতে গেলে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি আবেগগত সক্রিয়তা থাকা চাই। চেষ্টা ছাড়া লক্ষ্য প্রাপ্তি বা আনন্দ প্রাপ্তি সম্ভব নয়।

প্রাবন্ধিক শ্রমের নান্দনিকতাকে সৌন্দর্যবোধের সমতুল্য বলে মনে করেন। সৌন্দর্য দেখে মানুষ যেমন প্রশান্তি অনুভব করে তেমনি নান্দনিক শ্রম মানুষের মনে প্রীতি ও সুখ উৎপন্ন করে। নান্দনিক শ্রম শুধুমাত্র সুন্দর এর সঙ্গে জড়িত নয়। বিভৎস দৃশ্য, ভয়ং কর বা বিষাদময় ঘটনার মধ্যেও নান্দনিকতা জড়িয়ে থাকে। এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পুশকিন ও কার্লমার্ক্স এর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। ট্রাজেডি দুঃখের হলেও ক্যাথারসিস মানুষকে আনন্দ দেয়। প্রাবন্ধিক বলেছেন, "সুতরাং শ্রমের নান্দনিক সত্তা কেবল সুন্দরের মধ্যেই আবদ্ধ নয়; মহাৎ, বীরত্বপূর্ণ বা বিষাদময় কিছুর মধ্যেও অনেক সময় নান্দনিক অস্তিত্ব থাকে।"[৩] কার্লমার্ক্সের মতে মানুষের সৌন্দর্য বোধের উৎস হল সঙ্গীত সচেতন কান ও সৌন্দর্যদর্শী চোখ। মনুষ্য সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শ্রমপ্রক্রিয়ার ও সৌন্দর্যবোধের বিবর্তন কিভাবে হয়েছে দার্শনিক এঙ্গেলস তা বর্ণনা করেছেন। ধীরে ধীরে মানুষের গড়ে উঠেছে শিল্পবোধ। সমস্যাকে অতিক্রম করে অভিষ্ট লাভ করাতেই আনন্দ পাওয়া যায়। দার্শনিক হেগেল এর মতে নান্দনিক অনুভব আসলে এক মানবীয় আবেগ। তবে শ্রমের নান্দনিক পরিসর শ্রমের কষ্টকে লাঘব করে। Communism বা সাম্যবাদ মানুষকে তার সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী শ্রমের ব্যবস্থা করে দেয়। প্রাবন্ধিক বলেছেন, "শ্রমের সক্রিয়তার স্বাধীনভাবে ও অবাধে বাড়াবার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে একমাত্র কমিউনিজম বা সাম্যবাদই। তার কারণ প্রত্যেকে সেখানে নিজের অভিলাষ অনুযায়ী কর্মকুশলতা বাড়াবার ও প্রতিভা কাজে লাগাবার সুযোগ পায়।"[৪] এভাবে অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ থেকেও মানুষ আনন্দ পেতে পারে। এ প্রবন্ধে সৌন্দর্যতত্ত্বের মূল উৎস থেকে বর্তমান সমাজিক সমস্যা, কোন কিছুই বাদ যায়নি। তিনি জটিল তত্ত্বকে ক্ষুদ্র পরিসরে অতি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন এই প্রবন্ধে।

'রবীন্দ্র-নাট্যের রবীন্দ্র-ভাষ্য' প্রবন্ধে 'শারোদৎসব', 'বিসর্জন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ভাষ্যগুলিকে তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক। মহান সাহিত্যিকগণ নিজের নিজের মূল্যবোধ ও ভাবনা অনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করেন। পাঠক বা দর্শক এর কাছে একই সৃষ্টির নানারকম ভাষ্য হতে পারে। এই ভাষ্য নিয়ে নানা বিতর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই বিতর্ক এড়াতেই কোনো কোনো শিল্পী-সাহিত্যিক তাদের নিজেদের সৃষ্টির নিজস্ব ভাষ্য বা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবুও তাতে বিতর্ক এড়ানো যায়নি। যেমন রবীন্দ্রনাথ কোথাও নাটকের ভূমিকায়, কোথাও বক্তৃতায়, কোথাওবা চিঠিপত্রে তাঁর অনেকগুলি নাটকের ভাষ্য নিজেই দিয়ে গেছেন।

মহৎ শিল্পের মধ্যে কিছুটা রহস্যময়ী ভাব থাকে। তাই যতখানি প্রকাশিত থাকে তারচেয়ে বেশি থাকে অপ্রকাশিত। আসলে "সৃষ্টির সময় স্রষ্টার সচেতন, অবচেতন, ও অচেতন এই তিনটি মনই কাজ করতে পারে।"[৫] সৃষ্টির পরে স্রষ্টা যখন সচেতন মন নিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করেন তখন তার ব্যাখ্যা অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। তবে স্রষ্টার নিজের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য থেকে থাকলে বিতর্ক অনেকাংশে এড়ানো যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেকগুলি নাটকের ভাষ্য নিজেই দিয়েছেন। বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের জন্য তিনি লিখেছিলেন 'শারোদৎসব' নাটকটি। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি এই নাটকের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এরপর ১৩২৯ বঙ্গাব্দে কোলকাতায় অভিনয়ের সময়ের তিনি নাটকটির একটি ভূমিকাও রচনা করেছিলেন। সেখানে তিনি নাটকটি সম্পর্কে

তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তিতে এই নাটকটির নাম পরিবর্তন করে তিনি রেখেছিলেন 'ঋণশোধ'। 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকটির নাম পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কেও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবুও এই নাটক নিয়ে সমালোচনা হয়েছে।

একইরকমভাবে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে রচিত 'ডাকঘর' নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একাধিক ভাষ্য পাওয়া যায়। ১৩২২ বঙ্গাব্দের ৪ঠা পৌষ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ডাকঘর' নাটকটির বিষয়ে বক্তব্য দেন। নাটকটি রচনার পর শ্রীনির্ঝরিণী সরকারকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাঁর সুদূরের পিপাসা ব্যক্ত করেন। যা ছিল 'ডাকঘর' নাটকের মূল সুর। দীনবন্ধু সি.এফ্. এন্ড্রুজকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে ডাকঘরের অমল সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ভাবনার কথা লিখেছিলেন। এরপরেও ডাকঘরের অমলকে নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "ডাকঘরের অমল মরেছে বলে সন্দেহ যাঁরা করে তারা অবিশ্বাসী-রাজবৈদ্যের হাতে কেউ মরে না-কবিরাজ ওকে মারতে বসেছিল বটে।"[৬]

১২৯৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় 'বিসর্জন' নাটকটি। নাটকটিতে লিরিকের বাড়াবাড়ি কেন রেখেছেন নাট্যকার তার ব্যাখ্যা সংযোজন করেছেন এই নাটকের উৎসর্গ পত্রে। 'মুক্তধারা' নাটকটি নিয়েও প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। অনেকেই অভিযোগ জানিয়েছেন এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রবিজ্ঞানকে অস্বীকার করেছেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে শ্রী কালিদাস নাগকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। "যন্ত্র বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা নয়; যন্ত্র বিজ্ঞান করায়ত্ত করে মানুষের মধ্যে যে দম্ভ আসে ও পরপীড়নের প্রবৃত্তি জাগে তা চূর্ণ করাই মুক্তধারা নাটকের উদ্দেশ্য।"[৭]

'রক্তকরবী' নাটক সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ একাধিক ভাষ্য দিয়েছেন। নাটকের প্রস্তাবনা অংশেই তিনি এই নাটকের রূপকধর্মীতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে লিখিত একটি অভিভাষণেও তিনি এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বিভিন্ন আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্ব, রামায়ণ কাহিনির সঙ্গে মিল ও অমিল প্রভৃতি বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। অবশেষে প্রাবন্ধিক মনে করেন এ বিষয়ে আরো অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্র নাটকের অভিনয় বিকৃতি ও অর্থ বিকৃতি স্তব্ধ করার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাটক সম্পর্কিত নাট্যচক্র স্থাপনার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন রবীন্দ্রনাটক মঞ্চরূপায়নের একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করার প্রয়োজন। এর ফলে রবীন্দ্রনাটক বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

কোনো সৃষ্টির ভাষ্য ঐ সৃষ্টি সম্পর্কে আমদের ধারণাকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করে। কখনো বিকৃত ব্যাখ্যার হাত থেকে কখনো সমালোচনার হাত থেকে বাঁচতে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন চিঠিতে, প্রবন্ধে, ভূমিকায় বা নাটকের উৎসর্গ পত্রে এই ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রাবন্ধিক দিগিন্দ্রচন্দ্র অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সেই সকল ভাষ্যগুলিকে এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিকের এই গবেষণা অনুসন্ধিৎসা অন্যদেরকেও এই ধরনের গবেষণায় অনুপ্রাণিত করবে।

গণনাট্য ও নবনাট্য আন্দোলনের গতি প্রকৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ: এই শ্রেণির প্রবন্ধগুলিতে মার্ক্সবাদী চিন্তা ও চেতনার ছাপ বেশ মোটা দাগে অঙ্কিত রয়েছে। বিশ শতকের শেষদিকে গণনাট্য আন্দোলনের লক্ষ্যভ্রষ্ট অবস্থা প্রাবন্ধিককে ভাবিয়ে তুলেছিল। গ্রুপ থিয়েটারগুলির যথেচ্ছাচার তাঁকে পীড়া দিয়েছে। নবনাট্যের নাম করে গণনাট্য তার লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছিল। গণনাট্য ও নবনাট্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য, গতি-প্রকৃতি, মতাদর্শের দ্বন্দ্ব, বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন একাধিক প্রবন্ধে।

'নাট্যচিন্তাঃ শিল্পজিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'জীবনবোধ ও শিল্পরুচি' অধ্যায়ের **'গড্ডলিকার সংস্কৃতি'** প্রবন্ধে তিনি গড্ডলিকা স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক দুরাবস্থার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা লাভের পর অবস্থা চাপে পড়ে বহু বিষয়ে ভারতবাসীর মোহভঙ্গ হয়েছিল। শিল্প সংস্কৃতিও পথের দিশা হারিয়ে ফেলেছিলো। কৃত্রিম আবেগ, কৃত্রিম চরিত্র, কৃত্রিম ঘটনা, প্রকৃত জীবন ও সমাজ বাস্তবতা থেকে শিল্পকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছিল।

সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধানের পথ এই সময়ের সাহিত্যে ফুটে ওঠেনি। প্রাবন্ধিক মনে করেন প্রকৃত জীবনকে এড়িয়ে গিয়ে কখনও কখনও নৃত্য সংগীত নাটক সাহিত্য কৃত্রিম উত্তেজনার ফাঁদে আটকে পড়ে। এই ভুল পথে বেশি অর্থ উপার্জনের নেশায় শিল্পী-সাহিত্যিকরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এতে শিল্পীদের অধঃপতন হয়। শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে এই সততার অভাব দেখা দিলে তাদের সৃষ্টি থেকে কৃত্রিম উত্তেজনা দেখা দেয়। শিল্প-সাহিত্য তার স্বাভাবিক সুষমা হারায়। শিল্পী সাহিত্যিকদেরকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ হতে হবে তবেই সুশিল্প সৃষ্টি হবে এবং মানুষের মনে পুনরায় সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হবে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ শিল্পী সাহিত্যিকদেরকে প্রাবন্ধিক কুসংস্কৃতির গড্ডলিকা প্রবাহ থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখিয়েছেন।

'পরস্পরবিরোধী দুই শিল্পচিন্তা' প্রবন্ধে তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের দুই বিপরীতধর্মী শিল্প চিন্তা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তখন বিদেশে এবং এদেশে পরস্পরবিরোধী দুই শিল্প চিন্তার সংঘাত দেখা দিয়েছিল। যার মধ্যে একটি হলো সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবোধ নির্ভর সামষ্টিক কল্যাণ চেতনা আর অন্যটি হলো সামষ্টিক জীবনবোধ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি চেতনা। প্রথমটি বলে সমাজের পিছিয়েপড়া সকল শ্রেণির মানুষের উন্নয়নের কথা আর দ্বিতীয়টি বলে ব্যক্তিমানুষের উন্নয়নের কথা। এই সংকীর্ণ শিল্পচিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে মানুষকে সত্যের দিকে অগ্রগতির পথ দেখিয়ে দিতে হবে। রাজনৈতিক বিপ্লবীরা একজন সমাজ সংস্কারক সমাজের বাইরের রূপকে তারা পরিবর্তন করেন। কিন্তু তার আগে চাই মানুষের মনের পরিবর্তন কারণ মনের পরিবর্তন না হলে সামাজিক পরিবর্তন তারা ভালো চোখে মেনে নিতে পারবে না। মার্কসবাদীরা বলে এই ধরনের সমাজ সংস্কারের কথা। এছাড়াও বহু কৃতী লেখক ও শিল্পী শিল্প-সাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। "যেহেতু বিভিন্ন দেশের সামাজিক কাঠামোতে পার্থক্য ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির আছে সেহেতু শিল্প-সাহিত্যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য আসতে বাধ্য।"[৮] প্রাবন্ধিক মনে করেন বর্তমান সমাজে দুই ধরনের শিল্পী-সাহিত্যিক রয়েছে প্রথমতঃ সোশ্যালিস্ট রিয়ালিস্টি আর দ্বিতীয়তঃ বুর্জোয়া ক্রিটিকাল রিয়ালিস্টি। প্রথম পর্যায়ের শিল্পীদের প্রাবন্ধিক বলেছেন কমিটেড বা দায়বদ্ধ শিল্পী। এরা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। দ্বিতীয় শ্রেণির ক্রিটিকাল রিয়েলিস্টরা সমাজসমস্যা থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। এদের সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রাধান্য পায়। একদিকে সমাজবদলের প্রত্যয় অন্যদিকে ব্যক্তিজীবনের প্রত্যয় হীনতা, সমাজে এই দুইয়ের সংঘাত চলছে। সমাজবদলের রূপকারদের আমরা বলতে পারি প্রগতিশীল। ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য প্রাবন্ধিক এই প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্যিকদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।

নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় দীর্ঘ ৪০ বছর নাট্য জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই দীর্ঘ বছরের অভিজ্ঞতা অকপটে ব্যক্ত করেছেন **'স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটক এর গতি-প্রকৃতি'** প্রবন্ধে। সমাজ সচেতন নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রবন্ধে প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা নাট্য আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বর্তমান বাংলা নাটক কোন পর্যায়ে চলছে এবং তার ভবিষ্যৎ কি এ বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। কিভাবে সুশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে এবং সৎ শিল্পের জন্য সরকারের কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত সে বিষয়েও তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। নিজেকে তিনি একজন সমাজ সচেতন নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর মতে, "সামাজিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেউ যদি ব্যক্তিসত্তাকে দেখার চেষ্টা করেন তবে সেই ব্যক্তিটি উপস্থিত হবে স্রষ্টার নিছক কল্পনা প্রসূত রূপক হয়ে।"[৯] প্রাবন্ধিক বলতে চেয়েছেন যেকোনো রচনাকে আমরা বিচার করি তার শিল্পমূল্যের নিরিখে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটকের শিল্পমূল্য কতটা আছে সেটা বিচার করে দেখতে হবে।

১৯৪৭ সালে ভারতবাসী যে দ্বিখন্ডিত স্বাধীনতা লাভ করে সেখানে স্বাধীনতার পরে জাতীয় সংহতির অভাব দেখা দেয়। সমাজে তৈরি হয় পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ এভাবেই সমাজে শ্রেণি বিভাগ এবং শ্রেণি সংগ্রামের সূচনা হয়। "শোষণ যেখানে শ্রেণিগত সেখানে তা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামও শ্রেণিগত হতে বাধ্য; কারণ শ্রেণিগত শোষণটা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।"[১০] প্রাবন্ধিকের মতে শ্রেণি সংগ্রামের মূল কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য। এই বৈষম্য দূর করতে

পারলেই সমাজে সংহতি আসবে। সৎ নাট্যকারদের এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। সামাজিক ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ নানান বঞ্চনার শিকার হয়। নাট্যসাহিত্যে এই বৈষম্যের কথা তুলে ধরতে হবে।

প্রাক্ স্বাধীনতাকালে রচিত নাটক গুলিতে স্বদেশ প্রাণতা ফুটে উঠেছিল তীব্রভাবে কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী কালে স্বদেশপ্রেমের আবহাওয়া বদলে যায়। প্রত্যেক নাট্যকারের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবনার সৃষ্টি হয়। প্রাক্ স্বাধীনতাকালের বাংলা নাটকের লক্ষণ এবং গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাবন্ধিক যা বলতে চেয়েছেন তা হল,

১) আবেগসর্বস্ব একদল নাট্যকার পুরাণ ধ্যান-ধারণা নিয়ে নাটক রচনা করে চললেন।
২) একদল প্রবীণ নাট্যকার সমকালীন ঘটনার মূল কারণ অনুসন্ধান না করে নাটক রচনা করেন ফলে তাদের নাটকে নতুন মূল্যবোধের অভাব রয়ে যায়।
৩) নবাগত নাট্যকারদের "নাটকগুলিতে যতটা ভাবালুতা, উচ্ছ্বাস ও কষ্টকল্পনা স্থান পেল, সমাজব্যাধির মূল কারণগুলিতে আলোকপাত ততখানি দেখা গেল না।"[১১]

প্রাবন্ধিক বলতে চেয়েছেন সমস্যার মূল কারণগুলো চিহ্নিত না করে সমস্যার সুরাহা করা যায় না। জাতীয় সংহতির প্রধান অন্তরায়গুলিকে চিহ্নিত না করলে জাতীয় সংহতি আনয়ন করা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা ও জাতীয় সংহতির মূল সমস্যগুলি বোঝার জন্য আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং শক্তি বিন্যাসের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সমাজে উদ্ভূত নানা রকম সামাজিক সমস্যার কথা তিনি এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। যেমন,

ক) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,
খ) দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা,
গ) উগ্র প্রাদেশিকতা,
ঘ) ভাষা জেহাদ,
ঙ) হরিজন নির্যাতন ইত্যাদি।

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা নামক ব্যাধির শিকার হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ-আসাম-ত্রিপুরা এই তিনটি রাজ্য এবং বাংলাদেশ। দেশ-কাল-পাত্র ভুলে এই সময়ের অনেক নাট্যকারের রচনাতেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ফুটে উঠেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন সমাজের দ্বিতীয় সমস্যা উদ্বাস্তু সমস্যা। দেশে এবং বিদেশের বহু নাটকে এই সমস্যাটিকে তুলে ধরা হয়েছিল। চীন-ভারত যুদ্ধের সময়ে কিংবা পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় নাট্যকাররা দেশাত্মবোধক নাটক লিখেছিলেন। আন্তর্জাতিক স্বচ্ছ দৃষ্টি নাট্যকারদের মূল্যবোধকে পরিশোধিত করে।

সমাজের অভ্যন্তরে সবসময়ে বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হতে থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তী কালেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রাজনৈতিক ইন্ধন পেয়ে উগ্র আঞ্চলিকতা, ভাষা জেহাদ, হরিজন নির্যাতন এর মতো ঘৃণ্য ঘটনা ঘটতে থাকে। প্রাবন্ধিকের মতে এসব দুঃখজনক ঘটনার পিছনে রয়েছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সাম্প্রতিক হাঙ্গামা গুলির মূল কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে অনগ্রসরতার শ্রেণির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কায়েমী স্বার্থই এসব ঘটনা ঘটইয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতারা এই দাঙ্গাকে ক্ষমতার লাভের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। প্রাবন্ধিক এখানে শুধু সমস্যার কথাই বলেননি এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথও নির্দেশ করেছেন। এই অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার জনিত সমস্যার মূল কারণ ও অশিক্ষা। শিক্ষার আলোতেই মানুষের সাংস্কৃতিক মুক্তি ঘটবে। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তি ও চাই। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী না হলে মানুষ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কদর বুঝবে না। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তরুণ নাট্যকারদের বাংলা নাটকে ক্রুদ্ধ যৌবনের স্বর শোনা যায়। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে তারা ভেঙ্গেচুরে ফেলতে চান। কিন্তু তার প্রতিকার সম্বন্ধে সকলে একমত নন। অনেক নাট্যকার আছেন যারা নাটকের চরিত্র গুলিকে সামাজিক সত্তা সহ উপস্থাপিত করেন। এতে সমাজের অভ্যন্তরে দ্বান্দ্বিক নিয়মে চলতে থাকা বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। নাট্য সাহিত্য জীবনের কাছাকাছি

চলে আসে। আবার অনেক নাট্যকার সস্তায় বাহবা পাওয়ার জন্য বিপ্লবের কৃত্রিম আবেগ সৃষ্টি করেছেন। বিপ্লবের নামে এসব নাটক প্রতিবিপ্লবকেই ইন্ধন যুগিয়েছিল। বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নাট্যসাহিত্য কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না। "কিন্তু সচেতন ভাবে তা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা যাঁদের তাঁরা জাতির প্রধান সমস্যা থেকেই সযত্নে নিজেদের চিন্তা দূরে রেখে কার্যত পলায়নী মনোবৃত্তিরই পরিচয় দেন।"[১২] তথাকথিত এই সব আধুনিক নাট্যকাররা সমকালীন সমাজ বাস্তবতা থেকে দূরে থেকেই নাটক রচনা করেছিলেন। সমাজ বাস্তবতা থেকে দূরে গিয়ে তারা আধুনিকতার নতুন অর্থ খুঁজেছিলেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন সৃজনশীল সাহিত্য সম্পর্কে নাট্যকারদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। সমকালীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রভাব সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকতে হবে। 'নতুনের জন্যেই নতুন' বললেই তা আধুনিকতা হয় না। সমাজের নেতিবাচক ধারণা গুলি নিয়ে হা-হুতাশ করা কোন কাজের কথা নয়। ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার মৃত্যু হয় পাশাপাশি নতুন সভ্যতার জন্ম হয়। তাই চলমান ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বর্ধিষ্ণু সমাজের দিকে তাকিয়ে মানুষের ঐক্যের বন্ধন আরো দৃঢ় করতে উদ্যোগ নিতে হবে। নবনাট্য আন্দোলন এর ছত্রতলে একদল নাট্যকার নতুন কিছু আমদানি করার নামে ধার করা বিকৃত চিন্তা ও চেতনা লালন করছেন। তাঁরা প্রগতিশীল নাট্যকার হিসেবেও আখ্যা পেয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলা নাটকে কদর্যতা ক্রমশ বাড়তি জায়গা করে নিয়েছে। ব্যবসায়িক theatre গুলি ব্যবসার প্রয়োজনে নাটকে আমোদ-প্রমোদের ঢালাও অনুমোদন দিয়েছে। কিছুকিছু theatre আব্রু রেখে নাচ গানের জলসা বসিয়ে দর্শক টানার চেষ্টা করে চলেছে অনেকে আবার নাটকের মাঝে ক্যাবারে নর্তকী আমদানি করছে। এভাবে ব্যবসায়িক স্বার্থে বাংলা নাটকের মান অবনত হয়েছিল। প্রাবন্ধিক তাদের সমর্থন করেননি। যদিও কিছু নাট্যশিল্পী তিন-চার দশক ধরে অর্থ, প্রতিপত্তি বা পুরস্কারের লোভ ত্যাগ করে জনজীবনকে উজ্জীবিত করার বাসনায় সু-শিল্পের পরিপোষণ করে চলেছিল। দেশের সরকারেরও উচিত এই ধরনের সু-শিল্পের পৃষ্ঠপোষণ করা। সুশিল্প ও সৎ নাটকের জন্য সুশিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা করতে হবে। দেশের সরকারকেও সুনাট্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। প্রাবন্ধিকের এই মতামত চিরন্তন সত্য।

'গণনাট্য আন্দোলনের উত্তরাধিকার', 'সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে মতাদর্শের দ্বন্দ্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধে চল্লিশের দশকের বাংলা গণনাট্য অন্দোলনের গতিপথ পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই সময়ের নাট্যকারদের মনে গণনাট্য অন্দোলনের আদর্শ নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। একজন দায়বদ্ধ শিল্পীর মতো দিগিন্দ্রচন্দ্র এই প্রবন্ধগুলিতে সেই দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা করেছেন।

জনৈক তরুণ অধ্যাপক (ড. রায়) নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন চল্লিশের দশকের বাংলা গণনাট্য অন্দোলনের গতিপথ আজ পরিবর্তিত হয়ে গেছে কেন? ওই তরুণ অধ্যাপক গণনাট্য আন্দোলনের মোড় পরিবর্তনের জন্য গণনাট্য আন্দোলনের পরিচালকদের দুর্বলতা ও দূরদৃষ্টির অভাবকেই দায়ী করেন। এই জটিল অভিযোগের উত্তর নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক দিগিন্দ্রচন্দ্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন **'গণনাট্য আন্দোলনের উত্তরাধিকার'** প্রবন্ধে।

চল্লিশের দশকে ভারতবর্ষের এবং তৎকালীন বিশ্বের যে রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল তার ফলশ্রুতিতেই গণনাট্য সংঘের জন্ম হয়েছিল। আসলে যুগের মেজাজ অনুযায়ী মানুষের দৃষ্টি ও রুচি বদলে যায়। পরবর্তি যুগের নতুন অভিজ্ঞতা মানুষের দৃষ্টি ও রুচি বদলে দিয়েছিল তাই নাট্য বিষয়ে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। চল্লিশের দশকে বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কালোবাজারি, দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে ভারতীয় ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা শতছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে দুর্গত মানুষদের দুর্গতি থেকে মুক্তি দেবার জন্য একদল শিল্পী শিল্প-সাহিত্যকে গণমুখী করে তুলেছিলেন। শিল্পে, সাহিত্যে, নৃত্যে, সঙ্গীতে, নাট্যাভিনয়ে নবজাগৃত সংস্কৃতির জোয়ার এসেছিল। বহু শক্তিমান শিল্পী ও সাহিত্যিক সেদিন এই গণনাট্য সংঘে যোগ দান করেছিলেন। বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষে বিচিত্র সাংস্কৃতির মিলন ঘটিয়েছিল গণনাট্য সংঘ। তাই

ইতিহাসের বিচারে এটিকে হুজুগ বা সাময়িক উত্তেজনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে কেন এই সর্বভারতীয় অন্দোলনের মূল চরিত্রের এতোখানি পরিবর্তন হলো তা নিয়ে সার্বিক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। গণনাট্য আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস নেই বলেই বর্তমান প্রজন্মের অনুসন্ধিৎসু মানুষের মনে গণনাট্য আন্দোলন সম্পর্কে নানা রকম ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। সেদিনকার গণনাট্য সংঘের সক্রিয় কর্মী ও পরিচালকদের যারা বেঁচে আছেন তাঁরা উদ্যোগী হলে, প্রত্যেকের স্মৃতিচারণার টুকরো টুকরো অংশগুলিকে সংগ্রহ করে এবং তা সম্পাদিত করে গণনাট্য সংঘের ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে। প্রাবন্ধিক গণনাট্য সংঘের প্রকৃত গবেষণামূলক ইতিহাস রচনায় অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়েছেন। তিনি মনে করেন বর্তমানে প্রচলিত একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে গননাট্যের প্রতিবাদী ধারা এখনো প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তাই একাঙ্ক নাটক দেখে প্রাবন্ধিক মন্তব্য করেছেন, "... গণনাট্যের ধ্যান-ধারণা ও তার প্রবাহ একেবারে মরে যায়নি। তার মূল প্রবাহের পূর্ব গতিবেগ হয়তো নেই, তার ঐক্যরূপও অনুপস্থিত। কিন্তু মূল ধারা বহুধা বিভক্ত হয়ে নানা উপধারায় প্রবাহিত হচ্ছে নানা দিকে যেগুলোর কোন স্থির লক্ষ্য নেই।"[১৩] গণনাট্য আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে গেলেও তার উত্তরাধিকার এখনো রয়ে গেছে। দায়বদ্ধ শিল্পীদের এই সমাজ পরিবর্তনের পথ দেখাতে হবে। বর্তমান জনজীবনের যন্ত্রণা, অর্থনৈতিক অসঙ্গতি, রাজনৈতিক অত্যাচার ইত্যাদির পরিবর্তন আনতে গেলে শিল্পীদেরকেই তাঁদের শিল্পের মাধ্যমে পথ দেখাতে হবে।

এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক দিগিন্দ্রচন্দ্র খোলামনে স্বীকার করেছেন যে কোনো ঐতিহাসিক আন্দোলন চিরদিন স্থায়ী হতে পারে না। বিংশ শতকের চল্লিশের দশকের গণমুখী শিল্প-সাহিত্যের প্রবল ধারা তাই আজ ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। তাঁর কণ্ঠে শোনাগেছে সামাজিক দায়বদ্ধ শিল্পীর সুর। তিনি বর্তমান প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন বাংলা নাটকের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। যে কোনো শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই উত্তরাধিকার বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে দায়বদ্ধতার শিক্ষাদেবে।

'সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে মতাদর্শের দ্বন্দ্ব' প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই। ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশককে এই প্রবন্ধে 'সাম্প্রতিক কাল' বলে উল্লেখ করেছেন প্রাবন্ধিক। গণনাট্যের জোয়ার তখন অনেকখানি স্তিমিত হয়েছে। বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারগুলি ব্যক্তিগত চিন্তা ও চেতনা থেকে নাটক রচনা ও প্রযোজনা করে চলেছে। সকল থিয়েটার একই চিন্তা বা তত্ত্বকে সমর্থন করে না ফলে তৎকালীন বাংলা নাটকে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের প্রতিফলন ছিল স্বাভাবিক। সমালোচক ও প্রাবন্ধিক দিগিন্দ্রচন্দ্র এই প্রবন্ধে সেই ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শগত দ্বন্দ্বকে বিশ্লেষণ করেছেন।

তৎকালীন বাংলা নাট্যকারদের ও নাট্য গোষ্ঠীদের মধ্যে তিনটি ধারা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। সেগুলি হল পরিবর্তনপন্থী, সংস্কারপন্থী ও আবর্তন পন্থী। পরিবর্তনপন্থীরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে নিজেদের প্রচার করতেন যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে তার পরিচয় পাওয়া যেত না। তাদের নাটকে শ্রেণি সংগ্রামী চেতনার যথেষ্ট অভাব ছিল। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) নামে একদল মধ্যবিত্ত যুবক সমাজ সংস্কারের আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু তাদের নাটকে কৃষকরা ছিল বিপ্লবের প্রধান নায়ক, শ্রমিকশ্রেণি ছিল অনুপস্থিত। শ্রমিকদের বাদ দিয়ে তারা কিভাবে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলবে এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাদের হাতে থাকবে তাদের নাটকে তা দেখানো হতো না। এদের নাটকে শ্রেণি সংঘাতের বদলে ব্যক্তিগত সংঘাত প্রধান হয়ে দেখা দেয়। রতন ঘোষের 'সমুদ্র সন্ধানে', রবীন ভট্টাচার্যের 'রক্তে রোয়া ধান', মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু' প্রভৃতি নাটকে শ্রেণিসংগ্রাম শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত হিংসা বা পারিবারিক শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। সমাজ পরিবর্তনকামী গণনাট্য কর্মীরা কখনও ব্যক্তিগত হিংসাকে সমর্থন করেন না। তাই প্রাবন্ধিক বলেন, "ব্যক্তি খুন গণ আন্দোলন বা শ্রেণিসংগ্রামের ক্ষতিই করে। সংগ্রামটা শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণির, ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয়।"[১৪] নকশাল পন্থীরা শ্রেণি সংগ্রামের নাম করে শ্রেণিশত্রু খতম করার অজুহাতে সমাজে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিয়েছিল। প্রাবন্ধিক কঠোরভাবে এই ব্যাক্তি সন্ত্রাসের নিন্দা করেছেন। নকশালবাদীদের মতো এই সময়ে নানা মতগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল যেমন, মাওবাদী, ট্রটস্কিবাদী,

নৈরাজ্যবাদী, সন্ত্রাসবাদী ইত্যাদি। অনেক শিল্প-সংস্কৃতিপ্রেমী বুদ্ধিজীবীরাও এই সন্ত্রাসের স্রোতে সেদিন গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণিকে বাদ দিয়ে শ্রেণিসংগ্রাম বেশিদিন চলতে পারে না ইতিহাস তার সাক্ষী দেয়। চেতনা নাট্য সংঘের নাটক 'মারীচ সংবাদ', 'জগন্নাথ', নান্দীকারের নাটক 'ফুটবল' প্রভৃতি অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেলেও নাটকগুলির কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এগুলিতে শ্রমিকশ্রেণির জাগরণকে অত্যন্ত অবহেলা করা হয়েছে। এই শ্রেণিটির নাট্যকারদের প্রাবন্ধিক পরিবর্তনপন্থী বলে উল্লেখ করেছেন।

গণনাট্য সংঘের সৎকর্মীদের প্রাবন্ধিক বলেছেন 'সংস্কারপন্থী'। কারণ গণনাট্য সংঘ ব্যক্তি হত্যা বা সন্ত্রাস চায় না। গণনাট্য সংঘ মানুষের হাতে মানুষ খুনের জন্য হাতিয়ার তুলে দেয় না। "শোষকশ্রেণির শোষণের হাতিয়ারগুলি কেড়ে নেওয়াই শ্রেণিসংগ্রামের লক্ষ্য; তাদের খুন করা নয়।"[১৫] শোষিত শ্রেণির বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শোষকশ্রেণির মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়ে সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোই সংস্কারপন্থীদের মূল লক্ষ্য।

আর তৃতীয় শ্রেণির বুদ্ধিজীবীদের প্রাবন্ধিক বলেছেন 'আবর্তনপন্থী'। আবর্তনপন্থীরা বিশ্বাস করেন মানব সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। মানব সংসারে যুদ্ধ মৃত্যু ধ্বংস ঘুরে ফিরে বারে বারে আবর্তিত হয়। এই আবর্তন থেকে মুক্তি অসম্ভব। অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের নাটকে মূলত এই ধারণা প্রতিফলিত হতে দেখা গিয়েছে। বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস', 'এবং ইন্দ্রজিৎ' প্রভৃতি নাটক তৎকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কিন্তু এইসব নাটকের মধ্যে কোন কাহিনী বা প্লট নেই। নাটকের শেষে রয়েছে অবসাদ, শূন্যতা আর হতাশার আবর্তনের কথা। তাই বাদল সরকারের ইন্দ্রজিৎ তীর্থের সন্ধান পায় না কেবল তীর্থ পথেই ঘুরতে থাকে। বিশ্বযুদ্ধের পরে শান্তি ও সংগতিপূর্ণ পৃথিবী, সাম্রাজ্যবাদের পতনের পর সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব, সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা সুখ-সমৃদ্ধি, এসব কিছুই আবর্তনপন্থী নাট্যকারদের নাটকে স্থান পায় না। মানুষের কাছে চরম হতাশার ছবি তুলে ধরে এই ধরনের নাটক। যে নাটক মানুষের কাছে আশা ও স্বপ্নের পথ খুলে দিতে পারে না প্রাবন্ধিক তাকে কালোত্তীর্ণ শিল্প বলে মানতে রাজী নন।

এই তিন শ্রেণির নাটককে বাদ দিয়েও ভিন্ন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বেশ কিছু নাটক লেখা হয়েছে। সেইসব নাটকগুলোতে শ্রেণিসংগ্রাম সরাসরি দেখানো না হলেও তাতে পরোক্ষভাবে সামাজিক চিন্তা-চেতনা স্থান পেয়েছে। কোন বিশেষ সামাজিক তত্ত্ব প্রচার করা শিল্পের উদ্দেশ্য নয়। তবে শিল্পের মধ্যে সামাজিক তত্ত্ব স্থান পেয়ে থাকে। তাই নাট্য সমালোচনা করতে গেলে নাটকের কাহিনী বা তথ্যের পাশাপাশি তত্ত্বগত দিকটিও খুঁটিয়ে বিচার করা দরকার। মার্কসবাদী সমালোচকগণ শিল্পের বিচার করতে গিয়ে মার্কসবাদী তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন।

এই ধরণের প্রবন্ধগুলিতে প্রাবন্ধিক মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তার আলোকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাংলা নাটকের মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব, স্বরূপ, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি দিকগুলি আলোচনা করেছেন। সেখানে সমাজে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন মতামত আলোচনা করে তিনি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজকে পরিবর্তন করার কথা বলেছেন। সমাজকে পরিবর্তন ও সংশধনের কাজে নাটকের ব্যবহার বাংলা নাটকের প্রায় শুরুর সময় থেকেই হয়ে আসছে। পণপ্রথা, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি তার প্রমাণ। সুতরাং এটা নতুন কিছু নয়। প্রাবন্ধিক বর্তমান ভারতবর্ষকে সাংস্কৃতিক সংকট থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতামতে মার্কসবাদী চিন্তা প্রাধান্য পেয়েছে। তবে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা নাটকের বিচিত্র গতিপথ দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১) বন্দোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র, 'প্রবেশিকা', নাট্যচিন্তাঃ শিল্পজিজ্ঞাসা, ইম্প্রেসন সিন্ডিকেট, কোলকাতাঃ প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। পৃঃ-১০

২) বন্দোপাধ্যায় দিগিন্দ্রচন্দ্র, 'নাটক সৃষ্টির উৎস', শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রবন্ধ, নবার্ক, কোলকাতাঃ প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮৬। পৃঃ ৮৪

৩) বন্দোপাধ্যায় দিগিন্দ্রচন্দ্র, 'শ্রমের নান্দনিকতা', শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রবন্ধ, নবার্ক, কোলকাতাঃ প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮৬। পৃঃ ৯৮

৪) ঐ, পৃঃ ৯৫

৫) বন্দোপাধ্যায় দিগিন্দ্রচন্দ্র, 'রবীন্দ্র-নাট্যোর রবীন্দ্র-ভাষ্য', শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রবন্ধ, নবার্ক, কোলকাতাঃ প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮৬। পৃঃ ৩৩

৬) ঐ, পৃঃ ৩৭

৭) ঐ, পৃঃ ৩৮

৮) বন্দোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র, 'আজকের শিল্পসত্য', নাট্যচিন্তাঃ শিল্পজিজ্ঞাসা, ইম্প্রেসন সিন্ডিকেট, কোলকাতাঃ প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। পৃঃ-৬৪

৯) বন্দোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র, 'স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটক এর গতি-প্রকৃতি', শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রবন্ধ, নবার্ক, কোলকাতাঃ প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮৬। পৃঃ ৯

১০) ঐ, পৃঃ ১০

১১) ঐ, পৃঃ ১১

১২) ঐ, পৃঃ ১৬

১৩) বন্দোপাধ্যায় দিগিন্দ্রচন্দ্র, 'গণনাট্য আন্দোলনের উত্তরাধিকার', শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রবন্ধ, নবার্ক, কোলকাতাঃ প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮৬। পৃঃ ৮০

১৪) বন্দোপাধ্যায় দিগিন্দ্রচন্দ্র, 'সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে মতাদর্শের দ্বন্দ্ব', শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রবন্ধ, নবার্ক, কোলকাতাঃ প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮৬। পৃঃ ১১৪

১৫) ঐ।